Nov. 2001

The Life of HAZRAT SAHIBZADA ABDUL LATEEF RA

হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ (রাঃ)-এর জীবনী

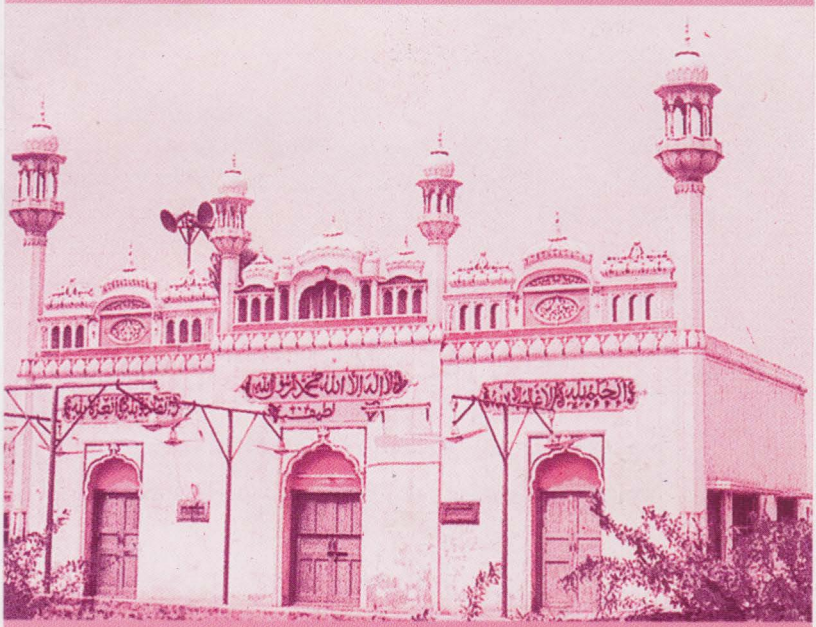

Lateef Mosque
named after Sahibzada Abdul Lateef Shaheed ra

প্রকাশনায় ঃ
মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ

হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ (রাঃ)-এর

জীবনী

মূল ঃ বি. এ. রফীক (লন্ডন)

ভাষান্তর ঃ আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ মোহাম্মদ

প্রকাশনায় ঃ ইশাআত বিভাগ
মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা -১২১১

প্রকাশকাল ঃ ১লা রমযান, ১৪২২ হিজরী
৩রা অগ্রাহয়ণ, ১৪০৮ বাংলা
১৭ই নভেম্বর, ২০০১ খ্রীস্টাব্দ

কম্পোজ ঃ রিন্‌ভী কম্পিউটারস্
২৮, নতুন আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

দাম ঃ পাঁচ টাকা

মুদ্রণে ঃ ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুখবন্ধ

বিশ শতকের প্রারম্ভে কাবুলের মাটিতে আফগানিস্তানের শাসকগোষ্ঠী দু'জন মহৎপ্রাণ আহমদীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এর পরিণতি সম্বন্ধে যুগের মসীহ্ হযরত আহমদ (আঃ) বলেন, "হে কাবুলের মাটি! তুমি সাক্ষী থাক, তোমার ওপরে অত্যন্ত অন্যায় করা হয়েছে। হে দুর্ভাগা দেশ! তুমি খোদার দৃষ্টিতে অধঃপতিত হয়েছ। তুমি এক ভয়ংকর জুলুমের স্থানে পরিণত হয়েছ" (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতায়েন)।

আল্লাহ্তাআলার প্রেরিত পুরুষদের এবং তাদের পবিত্র অনুসারীদের উপর উগ্রবাদীরা নিপীড়ন চালিয়ে কখনও সমাগত সত্যের প্রজ্জ্বলিত প্রভাকে নেভাতে পারে না। বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা আল্লাহ্তাআলা মু'মিনদেরকে কারাপীড়ন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, হত্যা বা নিশ্চিহ্নকরণের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ছাড়েন না। কাবুলের মাটিতে সত্যকে অস্বীকার না করার কারণে যে দু'জন মহৎপ্রাণের রক্তপাত ঘটানো হয়েছে আল্লাহ্তাআলা স্বহস্তে তার পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন।

১৯০১ সালের মধ্যভাগে এবং ১৯০৩ সালের ১৪ জুলাই তারিখে যথাক্রমে হযরত মৌলভী আব্দুর রহমান (রাঃ) এবং হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ (রাঃ)-কে আহমদীয়তে বিশ্বাস স্থাপনের কারণে আফগানিস্তানের শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত নির্মমভাবে– প্রথমজনকে শ্বাসরুদ্ধ করে এবং অপরজনকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে। এর ফলশ্রুতিতে কাবুলের শাসকগোষ্ঠীর শোচনীয় পরিণতি দর্শন করে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিগত ষাটের দশকে লন্ডনের The Muslim Herald পত্রিকার সম্পাদক বি. এ. রফিক সাহেব 'The Life of Hazrat Sahibzada Abdul Lateef' নামে একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাশ্চাত্যবাসীর উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেন। একই সময়ে (১৯৬৮ সালে) ঢাকার তৎকালীন সাংবাদিক (মরহুম) আবু আহমদ গোলাম আম্বিয়া সাহেব কর্তৃক প্রাগুক্ত পত্রিকার তথ্যের ভিত্তিতে 'একটি অবিস্মরণীয় নামঃ হযরত সাহেবজাদা আব্দুল লতিফ (রাঃ)' নামে একখানি নিবন্ধও প্রকাশিত হয়। বর্তমান পুস্তিকাটি প্রথমোক্ত পুস্তিকার একটি পরিবর্দ্ধিত অনুবাদকৃতরূপ।

যুগের ঘূর্ণাবর্তে, আফগানিস্তানের ইতিহাসে শতাব্দীকাল ধরে যে ঐশী তান্ডবলীলা সংঘটিত হয়ে চলেছে এবং সাম্প্রতিক যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রেক্ষাপটে মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ প্রাগুক্ত পুস্তিকা ও নিবন্ধের সমন্বয়ে "হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ (রাঃ)-এর জীবনী" নামে বর্তমান পুস্তিকাটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে অনুসারে জনাব আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ মোহাম্মদ 'এডিশনাল কায়েদ'

ইশায়াত, এই পুস্তিকার অনুবাদ ও পরিবর্দ্ধন কাজ সম্পন্ন করেন। মূল পুস্তক সম্পর্কে ইংরেজ মানবতাবাদী এন. এ. স্ক্রিভনার (N. A. Scrivoner) যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা এ পুস্তকের শেষ প্রচ্ছদে তুলে দেয়া হয়েছে।

যুগ-খলীফার বিভিন্ন উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এক'শ বছর পরে প্রতিটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে। তাই হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ (রাঃ) এবং হযরত মৌলভী আব্দুর রহমান (রাঃ)-এর রক্তসিঞ্চিত কাবুল তথা সমগ্র আফগানিস্তানে একদিন যে আল্লাহ্‌তাআলার লক্ষ লক্ষ প্রেমিক-হৃদয় জেগে উঠবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা বিশ্ববাসীকে সেই দিনেরই শুভ সংবাদ দিচ্ছি।

পরিশেষে, এ প্রকাশনার কাজে মৌলভী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, জনাব আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ মোহাম্মদ এবং আরও যারা সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন তাদের সবাইকে আল্লাহ্‌তাআলা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

খাকসার

ঢাকা, ১লা রমযান, ১৪২২ হিজরী
১৭ই নভেম্বর, ২০০১ ঈসাব্দ

মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন
সদর, মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ।

হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ (রাঃ)

হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব ১৮৫৩ সালে এক সুসম্ভ্রান্ত আফগান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তাঁর গোত্রের প্রধান এবং অগাধ ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। কাবুলের রাজপরিবারে তাঁর যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর ছিল। এদিক থেকে দেখতে গেলে সাহেবযাদা সাহেব জন্মের সময় রুপার চামচ মুখে নিয়েই জন্মেছিলেন।

এক পরম অভিজাত সম্প্রদায়ে হযরত সাহেবযাদা সাহেব শৈশব কাল কাটান এবং বাল্য শিক্ষা শেষে আরো জ্ঞানার্জনের জন্য আফগানিস্তানের বিভিন্ন ধর্মীয় মাদ্রাসা ও কতিপয় খ্যাতনামা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করেন।

সাহেবযাদা সাহেব তাঁর শিক্ষা সমাপনের পর খুশ্‌তে তাঁর নিজ গ্রাম সৈয়্যদগাহে ফিরে আসেন। চারিত্রিক সততা, অনুগামীদের প্রতি ভালবাসা এবং ইসলাম সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞানের জন্য সমগ্র আফগানিস্তানে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর খ্যাতির কথা আফগানিস্তানের আমীর আব্দুর রহমান খানের কানেও এসে পৌঁছে। তিনি তাঁকে দরবারে তাঁর ধর্মীয় উপদেষ্টা হওয়ার প্রস্তাব করেন এবং নিয়োগ দেন। এভাবে তিনি কাবুলের রাজপরিবারে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। আমীর আব্দুর রহমান খান তাঁকে তার পুত্র ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের শিক্ষক নিযুক্ত করেন।

হযরত সাহেবযাদা সাহেব আফগানিস্তানের খুশ্‌ত জেলার অন্তর্গত একটি ছোট গ্রাম সৈয়্যদগাহের অধিবাসী ছিলেন। তিনি এ গ্রামের নিকটে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বানু (Bannu) এলাকায় প্রায় ত্রিশ হাজার একর জমির মালিক ছিলেন। এ জমি থেকে তাঁর যে আয় হ'ত তিনি তার বিরাট অংশ দুস্থ, বিধবা, এতীম এবং প্রজাদের সাহায্যে ব্যয় করতেন।

হযরত সাহেবযাদা সাহেব তাঁর গ্রামে একটি মসজিদ গড়ে তুলেন এবং এ মসজিদের চতুর্দিকে সেইসব বিদ্যানুরাগীদের জন্য ছোট ছোট কামরা নির্মাণ করেন, যারা আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর কাছে কতিপয় পাঠ গ্রহণ করতে এবং সম্মান জানাতে আসতেন তারা এই কামরাগুলো ব্যবহার করতেন। তিনি সর্বদা ঐসব বিদ্যানুরাগীদের থাকা ও খাওয়ার ব্যয়ভার বহন করতেন। আফগানিস্তানে এসব বিদ্যানুরাগীদের মধ্য থেকে তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ভক্ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তিনি পড়াশুনার প্রতি এত বেশি অনুরাগী ছিলেন যে, তিনি নিজেই একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। তাঁর পাঠাগারে ধর্মীয় দর্শন এবং ইসলামী সাহিত্যের বহু মূল্যবান পুস্তকের বিশাল সমাবেশ ছিল। পবিত্র কুরআন চর্চা এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গমের সাধনাই তাঁর জীবনের মহান ব্রত ছিল।

তিনি ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের জ্ঞান এমনভাবে লাভ করেন যে, তিনি আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং তাঁর অধিক সময় ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করতে থাকেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের সময় আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর বাণীর যে মুষল-ধারা বর্ষণ করতে শুরু করেছিলেন তা থেকে কিছু বিন্দু হযরত সাহেবযাদা সাহেবকেও দান করেছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌তাআলার নিকট থেকে পরপর কয়েকটি

ইলহাম লাভ করেন। তাঁর ইলহামসমূহ তিনি তাঁর একটি নোটবুকে লিপিবদ্ধ করেন, যা তিনি তাঁর গ্রেফতারের সময়ে তাঁর ঘরের এক কোণে পুড়িয়ে ফেলেন। তাঁর নিকট রয়ে রয়ে নিয়মিতভাবে ইলহাম নাযেল হতে শুরু করে যে, এ সময়টি প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্দীর আগমনের সময়। এভাবে তিনি এরূপ এক ইলহাম লাভ করেন এবং ভীত হয়ে পড়েন যে, তিনি কখনো কখনো ভাবতে লাগলেন যে, আল্লাহ্তাআলা যামানার মাহ্দী হিসেবে তাঁকেই প্রেরণ করেছেন। পরে তিনি জানতে পারেন যে, আল্লাহ্তাআলা কর্তৃক মসীহ্ ও মাহ্দী কাদিয়ানে নাযিল হবেন। পরবর্তী সময়ে কাদিয়ানে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত আহমদ (আঃ)-এর আগমনের দ্বারা তাঁর ইলহামগুলো পরিপূর্ণতা লাভ করে।

১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত রিভিউ অব রিলিজিয়নস্'র একটি নোটে আফগানিস্তানে সাহেবযাদা সাহেবের অবস্থান কীরূপ হয়েছিল তা প্রদর্শন করা হয়েছেঃ

"সর্বোপরি খুশ্তের একজন অত্যন্ত সম্মানিত মোল্লা, যিনি স্বয়ং আমীর কর্তৃক সম্মানিত ছিলেন, রাজদরবারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মাঝে তাঁর শিষ্য ছিল, আফগান রাজ্যে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার মানুষ তাঁর আনুগত্য করতো এবং যিনি বৃটিশ শাসনে ও আমীরের স্বায়ত্ব শাসনে এক বিশাল জায়গীরের অধিকারী ছিলেন- তিনি আহ্মদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাকে দেখতে এসেছিলেন। তাঁর নাম ছিল মৌলভী আব্দুল লতীফ এবং তিনি ছিলেন খুশ্ত প্রদেশের একজন বাসিন্দা। তিনি কাদিয়ানে দুই বা তিন মাস অবস্থান করেন, তারপর তিনি তাঁর নিজ দেশে ফিরে যান। সেখানে তাঁর প্রত্যাবর্তনের পরে আমীর হাবীবুল্লাহ খানের আদেশে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কয়েক মাসের দীর্ঘ কারাবাসের সময়ে তাঁকে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার, জায়গীর ফেরত এমনকি রাজকীয় সুবিধাদি পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও তিনি আহমদীয়তের শিক্ষাকে অস্বীকার না করার কারণে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুবরণ করেন।"

রিভিউ অব রিলিজিয়নস্, ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ সংখ্যায় প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) তৎসম্পর্কে নিম্নভাবে লিখেনঃ

"তুমি শুনেছ সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ, যিনি কাবুলের সর্বত্র একজন অতি সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত এবং বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন এবং তার পঞ্চাশ হাজারের মত অনুসারী ছিল, তিনি কীভাবে আমীর হাবীবুল্লাহ খানের দ্বারা অতি নিষ্ঠুরভাবে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুবরণ করেন।"

আমীর হাবীবুল্লাহ খানের রাজ্যাভিষেক

আফগানিস্তানে এই প্রথা ছিল যে, রাজদরবারে একজন অত্যন্ত সম্মানিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি রাজাকে মুকুট পরাবেন, প্রকৃতপক্ষে রাজার মাথার উপর মুকুট রাখা হয়ে থাকে। এ উপলক্ষ্যে এক বিশেষ উৎসবের আয়োজন করা হয় এবং সেখানে প্রায় সকল মহৎ ও প্রধান ব্যক্তিই অংশ গ্রহণ করেন। রাজমুকুট পরিধান উৎসব সম্পাদনের জন্য হযরত সাহেবযাদা সাহেব রাজা কর্তৃক মনোনীত হন। ১৯০১ সালের ৩রা অক্টোবর এই উৎসব সম্পাদন করে তিনি সমগ্র আফগানিস্তানে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্যতম হয়ে উঠেন। তিনি যেহেতু রাজার শিক্ষক ছিলেন, তাই রাজা প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে তার নিকট থেকে উপদেশ গ্রহণ করতেন। তাঁকে 'প্রিন্স' উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং রাজার উপদেষ্টা ছাড়াও আফগানিস্তানের সকল উলামার প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

সাহেবযাদা সাহেবের রাজনৈতিক গুরুত্ব

বৃটিশ ও আফগান সরকারের সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি এবং দু'দেশের মধ্যে সীমানা নির্ধারণের জন্য ১৮৯৩ সালে উভয় সরকারের পক্ষ থেকে যুক্ত কমিশন গঠন করা হয়। বৃটিশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন লর্ড মর্টিমার ডুরান্ড। তার নামানুসারে ব্রিটিশ-ভারত ও আফগান মধ্যবর্তী এ সীমারেখার নামকরণ করা হয় 'ডুরান্ড' (Durand) রেখা। ঐ প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্য ছিলেন নওয়াব স্যার আবদুল কাইয়ুম খান। আফগান সরকার হযরত সাহেবযাদা আবদুল লতীফ এবং সরদার শিরীন দিল খান সমন্বয়ে দু'সদস্যের প্রতিনিধি দল (Delegation) প্রেরণ করেন। হযরত আবদুল লতীফের প্রচেষ্টা ও পরামর্শ উভয় পক্ষের নিকট আদৃত হয়, ফলে সুস্পষ্টভাবে তাঁর সুখ্যাতি ও উচ্চ রাজনৈতিক গুরুত্ব আকাশচুম্বী হয়ে উঠে।

তৎকালীন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কুররাম দপ্তরে (Agency) পারাচিনর থেকে কমিশন দল তাদের দু'দেশের সীমারেখা নির্ধারণের কাজ শুরু করেন। সেখানে বৃটিশ প্রতিনিধিদলে পেশোয়ার নিবাসী সৈয়্যদ চান বাদশাহ্ নামক একজন আহ্মদী কেরানী ছিলেন। একদিন সাহেবযাদা সাহেবের সাথে বাক্যালাপকালে তিনি কাদিয়ানের প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত গোলাম আহ্মদ (আঃ)-এর উল্লেখ করেন। হযরত সাহেবযাদা সাহেব প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) সম্পর্কে জানার জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি তার ঐশীবাণী মারফত জানতে পেরেছিলেন যে, ঐ যুগই মাহ্দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্'র। তাই তিনি সৈয়্যদ চান বাদশাহ্কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্পর্কে আরও অবহিত করার জন্য বললে, সৈয়্যদ চান বাদশাহ্ তাঁকে হযরত প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর বিখ্যাত পুস্তক 'আয়নায়ে কামালতে ইসলাম' প্রদান করেন। হযরত সাহেবযাদা সাহেব তাঁর নিকট থেকে এই পুস্তক গ্রহণ করে অধ্যয়ন করেন। তাঁকে বলতে শুনা গিয়েছে, 'আমি ঐ রাতে এক মুহূর্তের জন্যও নিদ্রা যেতে পারি নি। পুস্তক পড়া শেষ করে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) এর সকল দাবি-দাওয়ার সত্যতায় দৃঢ় বিশ্বাসী হই'। এ পুস্তকটি তিনি কয়েকবার পাঠ করেন। কমিশন ১৮৯৩ সনের ৩রা ডিসেম্বর কাজ শেষ করেন এবং আফগান প্রতিনিধিদল কাবুলে ফিরে আসেন। প্রতিনিধিদলের উভয় সদস্যের সম্মানে রাজা এক বিরাট অভ্যর্থনার আয়োজন করেন এবং রাজদরবারে তাঁর ভাষণে তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সাহেবযাদা সাহেবের শিষ্য
মৌলবী আব্দুর রহমানের কাদিয়ান গমন

হযরত সাহেবযাদা সাহেব কাবুলে প্রত্যাবর্তনের পর, তিনি তাঁর অতি বিশ্বস্ত ও খ্যাতনামা শিষ্য হযরত মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেবকে কাদিয়ানে প্রেরণ করেন- যাতে তিনি কাদিয়ানে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর সংস্পর্শে থেকে এবং তাঁর মসীহ্ (আঃ) হওয়ার দাবী সম্পর্কে সাহেবযাদা সাহেবকে জ্ঞাত করতে পারেন। তাঁর সাথে আরও একজন ধার্মিক শিষ্য মৌলবী আব্দুল জলীলকেও প্রেরণ করেন। তারা উভয়ে কাদিয়ান পৌঁছে হযরত আহ্মদ (আঃ)-এর পবিত্র চেহারা মোবারক ও পারিপার্শ্বিক পবিত্র পরিবেশ দর্শন করে পুলকিত হয়ে উঠেন। তারা হযরত আহমদ (আঃ)-এর নিকট বয়াত গ্রহণ করেন এবং এ সম্পর্কে সাবেহযাদা সাহেবকে অবহিত করেন।

হযরত মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব কয়েকবার কাদিয়ান গমন করেন। তিনি শেষ বারের মত কাদিয়ান গমন করেন ১৯০০ সালে। তিনি সাহেবযাদা সাহেবের খরচেই কাদিয়ানে বসবাস করতেন। তাঁর কর্তব্য ছিল প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর সর্বশেষ ঐশীবাণীসমূহ সম্পর্কে তাঁকে (সাহেবযাদা সাহেবকে) নিয়মিত লিখে জানানো এবং কাদিয়ানের ঘটনাবলীর একটি ডায়েরী রাখা।

হযরত আব্দুর রহমান সাহেব আফগানিস্তান প্রত্যাবর্তনকালে জেহাদ-বিরোধী কিছু প্রচার পত্র (Pamphlets) সাথে নিয়ে আসেন, যা আহ্মদীয়া আন্দোলন কর্তৃক ভারতে ছাপানো হয়েছিল। এই সময়ে এই উপমহাদেশে বিশেষ করে আফগানিস্তানে দারুণভাবে জেহাদের ভুল ব্যাখ্যা প্রচারিত হচ্ছিল। জেহাদের নামে তখন বিধর্মীদের রক্তপাতের জন্য দারুণভাবে উস্কানি চলছিল। আমীর আবদুর রহমান এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে জেহাদের নামে আফগান উপজাতীয়দেরকে ক্ষেপিয়ে ব্রিটিশ-ভারতের বিভিন্ন এলাকা জবর-দখল করে তার রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে দেশের মোল্লা সমাজকে তিনি বিশেষভাবে ব্যবহার করে বৃটিশ বিরোধী এক যুদ্ধ বাধিয়েছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান পূর্ব থেকেই জেহাদ সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। জেহাদ সম্পর্কে হযরত আহ্মদের যুক্তিপূর্ণ এবং কুরআন ও হাদীসসম্মত ব্যাখ্যা তার খুবই মনঃপুত হয়। খুশ্তে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি হযরত আব্দুল লতীফের সাথে সাক্ষাত করেন এবং বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করে তিনি তার মোল্লা বন্ধুদের সাথে জেহাদের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য কাবুল চলে যান। সেখানে আফগানিস্তানের 'উলামাদের' অধ্যয়নের জন্য ভারত থেকে আনা জেহাদ বিরোধী প্রচারপত্র প্রদান করেন।

হযরত মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব প্রতিশ্রুত মসীহ্র শিক্ষানুসারে ঘোষণা করেন যে, 'বৃটিশদের হত্যা করা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া জেহাদ চালিয়ে যাওয়া বুঝায় না।'

ঘটনাবলীর বাকি অংশ বর্ণনার পূর্বে, আমার মনে হয় এখানে 'জেহাদ-এর একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিলে ভাল হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) তাঁর "আহ্মদীয়ত কী" নামক পুস্তকে নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন-

"আহ্মদীদের সম্বন্ধে একটি বড় রকমের ভুল ধারণা এই যে, তারা জেহাদ অস্বীকার করে। এটা মোটেই ঠিক নয়। আহ্মদীরা জেহাদ (ধর্ম-যুদ্ধ) অস্বীকার করে না। আহ্মদীরা শুধু বিশ্বাস করে যে, যুদ্ধ দু'প্রকারের; এক প্রকার যুদ্ধ আছে (ধর্মীয়-যুদ্ধ) যা জেহাদের মর্যাদা রাখে। আর এক প্রকার যুদ্ধ আছে (পার্থিব-যুদ্ধ) যা শুধুই যুদ্ধ। জেহাদের মর্যাদাভুক্ত যুদ্ধ তা-ই, শত্রু যখন বাহুবলে ধর্ম নষ্ট করতে চেষ্টা করে, তরবারীর ভয় দেখিয়ে মানুষের ঈমান নষ্ট করতে উদ্যত হয়, ধর্ম রক্ষা করার জন্য তখন যে যুদ্ধ করা হয় (তাই জেহাদ) বা ধর্ম-যুদ্ধ। যখনই পৃথিবীর কোন স্থানে এরূপ শর্তাবলী দৃষ্ট হয় জেহাদ তখনই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয হয়ে পড়ে। তবে জেহাদের একটি অপরিহার্য শর্ত আছে। তা এই যে, জেহাদের ঘোষণা অবশ্যই বিশ্বাসীদের ইমাম কর্তৃক হতে হবে। যদি জেহাদের দায়িত্ব ইমামের উপর ন্যস্ত না হয় তবে মুসলমানরা কখন, কোথায়, কীভাবে জেহাদের কর্তব্য পালন করবে তা জানতে পারবে না। পবিত্র সফলতাপূর্ণ জেহাদ অবলম্বনের জন্য বিভাগীয়

কর্তব্য এবং তদানুযায়ী লোক নিয়োগ অবশ্যই করতে হবে। দায়িত্বপূর্ণ নেতৃত্ব এবং গঠনমূলক প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে জেহাদ কোনই মূল্য রাখে না। যদি জেহাদের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী দৃষ্ট হয় এবং দায়িত্বপূর্ণ নেতৃত্ব পাওয়া যায় তখন দূরে সরে থাকে এমন প্রত্যেক মুসলমান গুনাহ্গার হবে। যখনই যে কোন দেশের আহ্মদী সম্প্রদায় জেহাদের কর্তব্য অস্বীকার করেছে তখন তারা এই-ই উপলব্ধি করেছে যে, ঐ সব পরিস্থিতিতে জেহাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল না।"

কাহিনীতে ফিরে আসছি, কাবুলের উলামারা রাজকীয় সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে আমীরের নিকট অভিযোগ করলো যে, মৌলবী আব্দুর রহমান জেহাদের ব্যাপারে মিথ্যা প্রচার করছেন। যেহেতু জেহাদ সম্পর্কে হযরত আহ্মদ (আঃ)-এর মতবাদ আমীর আব্দুর রহমানের সার্থের পরিপন্থী ছিল এবং উলামাদের প্রচলিত মতবাদেরও বিরোধী ছিল, এ জন্য হযরত আব্দুর রহমানকে তার দরবারে ডেকে পাঠালেন এবং গ্রেফতার করে আফগানিস্তানের উলামাদের দ্বারা তাঁর বিচার করলেন।

দীর্ঘ কয়েক মাস পর তাঁকে কারাগার থেকে পুনরায় কাবুলের আমীরের নিকট হাজির করা হল। আমীর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি পূর্বের ন্যায় জেহাদ সম্পর্কে হযরত আহমদ (আঃ)-এর মত পোষণ করেন কি না। হযরত আবদুর রহমান হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলেন এবং সাহসপূর্বক আমীরের সামনে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। তিনি আহ্মদী কি না জিজ্ঞাসিত হলে, তিনি স্বীকার করলেন যে, তিনি একজন আহ্মদী। আমীর তৎশ্রবণে তাঁর বিরুদ্ধে উলামাদেরকে রায় প্রদানের জন্য অনুরোধ করলেন। ফলে তারা স্থির করলো যে, মৌলবী আব্দুর রহমানকে অবশ্যই বধ করতে হবে। সুতরাং নির্দয় প্রাণ আমীর আদেশ দিলেন যে, তাঁকে হত্যা করা হোক আর এই আদেশে তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হলো।

এই ঘটনা ১৯০১ সালের মধ্য ভাগে সংঘটিত হয় এবং আহ্মদীয়তের ইতিহাসে হযরত মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব আফগানিস্তানে প্রথম আহ্মদী শহীদের মর্যাদা লাভ করেন (যিনি আত্মবিশ্বাসের জন্য জীবন বিসর্জন করেন)। তিনি ছিলেন আফগান উলামাদের অন্যতম ব্যক্তি এবং হযরত সাহেবযাদা সাহেবের 'খলীফা' বলে তিনি অভিহিত হতেন।

১৯০৩ সালে হযরত সাহেবযাদা সাহেবের নিকট তাঁর শহীদ হওয়ার সংবাদ পৌঁছে, যখন তিনি স্বয়ং কারাগারে ছিলেন। এই ঘটনা হযরত আহ্মদ (আঃ)ও শ্রবণ করেন এবং অত্যন্ত মর্মাহত হন। কারণ এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে তিনি এ সম্পর্কে একটি ইলহাম লাভ করেছিলেন যে, "দু'টি ছাগ জবাই করা হবে"। বস্তুত এই ইলহামটি হযরত মৌলবী আব্দুর রহমানের হত্যা হওয়ার দ্বারা আংশিক পূর্ণ হয়, বাকি অংশ পূর্ণতার অপেক্ষায় থাকে, যার বর্ণনায় পরে আসছি।

হযরত আব্দুর রহমানের হত্যাকারী নির্দয় আমীর আল্লাহ্র শাস্তি এড়াতে পারেন নি। তিনি ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১ সালে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন এবং বিছানায় পড়ে তার মৃত্যুর দিন গুনতে থাকেন। আফগানিস্তান ও ভারতের বড় বড় চিকিৎসকরা তার শয্যা পাশে সম্মিলিতভাবে চিকিৎসা প্রদান করেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং হযরত আব্দুর রহমানের নির্দয় হত্যার মাত্র তিন মাস পরে ৩রা অক্টোবর, ১৯০১ সালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

১৯০৬ সালে রিভিউ অব রিলিজিয়নস্ পত্রিকায় নিম্নোক্ত কথাগুলো প্রকাশিত হয়ঃ

আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের মাধ্যমে ঘোষিত জেহাদ বিরোধী মতবাদের প্রথম প্রকাশ্য প্রচারক একজন অধ্যাপককে চিনতে পারলে সাবেক আমীর তাঁকে হত্যা করে। এর পর খুশ্‌তের একজন অত্যন্ত সম্মানিত মোল্লা, যিনি স্বয়ং আমীরের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন এবং রাজ দরবারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যেও যার শীষ্য ছিল, আফগান রাজ্যে ৫০,০০০ অনুসারী এবং আমীর ও বৃটিশ স্বায়ত্ত-শাসনে যার বিশাল জায়গীর রয়েছে, তিনি আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তাঁর নাম মৌলবী আব্দুল লতীফ এবং তিনি খুশ্‌ত প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আমীর হাবীবুল্লাহ খানের রাজ্যাভিষেক উৎসব হযরত সাহেবযাদা সাহেব কর্তৃক ৩রা অক্টোবর, ১৯০১ সালে সম্পন্ন হয়। সাহেবযাদা সাহেব তখন প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে তাঁকে মক্কায় হজ্জ সম্পন্ন করার অনুমতি প্রদানের জন্য তিনি আফগান আমীরকে অনুরোধ করেন। আমীর শুধু অনুমতিই প্রদান করেন নি, অধিকন্তু তাঁর সফরের খরচের জন্য যথেষ্ট অর্থও দান করেন। হযরত সাহেবযাদা সাহেব ১৯০২ সালের অক্টোবরের মধ্যভাগে লাহোর যাত্রা করেন এবং ১৯০২ সালের অক্টোবরের শেষ ভাগে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। লাহোরে পৌঁছে তিনি জানতে পারেন যে, প্লেগ মহামারীর জন্য তুরস্ক সরকার ভারতীয় হজ্জযাত্রীদের আরবে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কাজেই হযরত সাহেবযাদা সাহেব মক্কায় তাঁর হজ্জ সম্পন্ন করা অন্য কোন বছরের জন্য স্থগিত রাখেন এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্'র সাথে সাক্ষাতের জন্য কাদিয়ান যাত্রা করেন।

১৯০২ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম ভাগে হযরত সাহেবযাদা সাহেব কাদিয়ান পৌঁছেন। ধর্মপরায়ণতা ও ধর্মীয় উৎসাহে আলোকিত প্রতিশ্রুত মসীহ্'র মুখমন্ডল দর্শন করে তিনি তাঁকে তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তার বয়াত গ্রহণ করবেন কিনা জিজ্ঞেস করেন। তিনি ১৯০২ সালের ডিসেম্বরে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত বার্ষিক জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি তখন লঙ্গর খানা অর্থাৎ মেহমান খানায় বাস করছিলেন। কাজী মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব বলেন যে, সাহেবযাদা সাহেব কাদিয়ানে মসজিদ মোবারকে ৫ ওয়াক্ত নামাযে উপস্থিত হতেন। তিনি সব সময় মসজিদের প্রথম সারিতে এক কোণে দন্ডায়মান হতেন। কাযী সাহেব আরো বলেন যে, সাহেবযাদা সাহেব তাঁর কক্ষে সকাল বেলায় উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করতেন, এত উচ্চস্বরে যে মেহমান খানার অন্যান্য মেহমানরাও তা শ্রবণ করতে পারতেন।

পবিত্র কুরআনের পঠন ও অধ্যয়ন তাঁর বিশেষ নেশা বা প্রিয় বস্তু ছিল। কাজী সাহেব বলেন, সাহেবযাদা সাহেবের এক সাধারণ মুজিযা ছিল যে, তিনি যখনই কোন পুস্তক থেকে কোন উদ্ধৃতি বের করতে চাইতন তিনি শুধু পুস্তকটি খুলতেন এবং সোজাসুজি তা পেয়ে যেতেন।

১৯০৩ সালের প্রারম্ভে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র বিরুদ্ধবাদী ভীন গ্রামের জনৈক মৌলবী করম দীন 'আল্‌হাকাম' পত্রিকার সম্পাদক হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানীর বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করেন। এই মামলার শুনানী ঝিলামে এক বিচারক কর্তৃক হচ্ছিল। এই বিচারক প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে সাক্ষী হিসেবে ডাকেন। প্রতিশ্রুত মসীহ উক্ত

মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দানের জন্য ১৯০৩ সালের ১৪ই জানুয়ারী ঝিলাম যাওয়ার জন্য কাদিয়ান ত্যাগ করেন। হযরত সাহেবযাদা সাহেব এই ভ্রমণে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর সাথী হলেন। জানা যায় প্রতিশ্রুত মসীহ ঝিলমে এক শ্রোতৃমন্ডলীর নিকট বক্তব্য রাখেন এবং তাঁর বক্তব্য উর্দূ ভাষায় শুরু করেন। মাত্র ক'টি শব্দ বলার পরই তিনি হঠাৎ করে ফার্সি ভাষায় তাঁর বক্তৃতা পরিবর্তন করে বলেন যে, যেহেতু সাহেবযাদা সাহেব উর্দূ জানেন না সেহেতু তিনি যে ভাষা বুঝেন সে ভাষাতেই বক্তৃতা দেয়া ভাল হবে। এই সম্মানবোধ বাস্তবিক পক্ষে তাঁর জন্য এক বিশেষ সম্মানের বিষয় ছিল।

১৯০৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে সাহেবযাদা সাহেব নিজ দেশে ফেরার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্'র নিকট থেকে অনুমতি লাভ করেন। প্রতিশ্রুত মসীহ্ তাঁর সাথে সুদূর বাটালার জল প্রণালী (Cannal) পর্যন্ত গেলেন। বিদায় বেলা হযরত সাহেবযাদা সাহেব প্রতিশ্রুত মসীহ্'র পদতলে লুটিয়ে কাঁদলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ও সাহেবযাদা সাহেবের প্রস্থানে মর্মাহত হলেন।

হযরত সাহেবযাদা সাহেব অল্পকালের জন্য লাহোর এবং পেশাওয়ারে অবস্থান করলেন। অতঃপর মাতৃভূমি খুশ্তে প্রত্যাবর্তনের পর, তিনি তাঁর ছাত্রদের একজন কাবুলের নগর কতোয়াল সরদার মোহাম্মদ হোসেন, যিনি ঐ সময়ে আফগান সেনাদলের একজন (সিআইসি) ছিলেন তাকে এবং ঘাসি সরদার আবদুল কুদ্দুসের নিকট বিস্তারিতভাবে এক পত্রে তাঁর ভারত সফরের পূর্ণ বিবরণ এবং যুগের মসীহ্ ও মাহ্দী, হযরত আহমদ (আঃ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ, তাঁর দাবী দাওয়া এবং স্বয়ং গ্রহণ করা সম্পর্কে লিখে জানান। এবং আফগানিস্তানের আমীরের নিকট তাঁর এই খবরগুলি পত্রসহ পৌঁছে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। পত্রগুলো ঘটনাচক্রে আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের ছোট ভাই সরদার নসরুল্লাহ খানের হাতে পড়ে। সরদার নসরুল্লাহ খান একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। সাহেবযাদা সাহেবকে তিনি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন, ফলে এই সুযোগে সাহেবযাদা সাহেব কর্তৃক লিখিত পত্রগুলো রাজার নিকট উপস্থিত করার সুযোগ গ্রহণ করলেন। তিনি রাজাকে ভয় প্রদর্শন করে সাহেবযাদা সাহেবকে অতি সত্ত্বর কাবুলে এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করার আদেশ প্রদানের জন্য বললেন। অবশ্য তিনি তাঁকে এ-ও বললেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ'র দাবি- দাওয়া সম্পর্কে সাহেবযাদা সাহেবের পত্রের বিষয়বস্তুতে যদি তিনি বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন তবে তিনিও তাঁকে গ্রহণ করবেন।

আমীরের নিকট থেকে পত্র পেয়ে সাহেবযাদা সাহেব কাবুল যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। একই সময়ে খুশ্তের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হযরত সাহেবযাদা সাহেবকে গ্রেফতারের জন্য এক নির্দেশ এসে পৌঁছে। এই ম্যাজিস্ট্রেট লোকটি অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। তিনি সাথে সাথে হযরত সাহেবযাদা সাহেবকে গ্রেফতার করেন এবং তাঁকে নিয়ে হাজতে আটকিয়ে রাখেন। জানা যায় যে, গ্রেফতারের পূর্বে তিনি তাঁর হাতের দিকে তাকান এবং বলেন, হে আমার হাত! তোমরা কি শৃঙ্খল ধারণ করতে পারবে! তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে এ কথার তাৎপর্য কী জানতে চাইলে সাহেবযাদা সাহেব তাদেরকে বলেন, এর তাৎপর্য কী তা তারা নিজেরাই দেখতে পাবে। পরে বিশেষ প্রহরাধীনে হযরত সাহেবযাদা সাহেবকে কাবুলে আনার পর রাজ প্রাসাদের পার্শ্ববর্তী একটি সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে আটকিয়ে রাখা হয় এবং তাঁরই ছাত্র আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের নিকট হাজির করা হয়।

আমীর তাকে তাঁর কাদিয়ান সফরের ভয়াবহতা সম্পর্কে সর্তক করে জনমতের খাতিরে তাঁর আহ্‌মদী হওয়ার কথা অস্বীকার করতে পরামর্শ দেন। সাহেবযাদা সাহেব আমীরকে বারবার একথা বলেন যে, তিনি কখনো সত্যকে অস্বীকার করতে পারবেন না। তিনি দৃঢ়তার সাথে জবাব দেন যে, তিনি কুরআন ও হাদীস দ্বারা পরীক্ষা করে যাঁকে সত্য বলে জেনেছেন, তাঁকে তিনি কখনো মিথ্যাবাদী বা অসত্য বলতে পারবেন না। তিনি বলেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে হযরত আহমদ (আঃ)-এর সত্যদাবীর একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

পরে আমীর তাকে নিজের কাছে আরও কয়েকবার ডেকে আনেন এবং তিনি যে একজন আহ্‌মদী তা অস্বীকার করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সাহেবযাদা সাহেব জানান যে, তার আহ্‌মদী হওয়ার কথা অস্বীকার করা অপেক্ষা মৃত্যুই তাঁর নিকট অধিক শ্রেয়।

আমীর স্বয়ং সাহেবযাদা সাহেবের একজন ছাত্র হওয়ার কারণে প্রকৃতপক্ষে তাঁকে মৃত্যুদন্ড দিতে ইচ্ছা পোষণ করেন নি। কিছুদিন পর হযরত সাহেবযাদা সাহেব রাজাকে অনুরোধ করলেন যে, তাঁকে যেন কাবুলের উলামাবৃন্দের সাথে জনসমক্ষে প্রকাশ্য বক্তব্য রাখার সুযোগ প্রদান করা হয়। যদি আলোচনার ফলা-ফলে তিনি মুরতাদ (apostate) বলে দোষী সাব্যস্ত হন, শুধু তখনই তাঁকে শাস্তি দেয়া যাবে; কিন্তু আফগানিস্তানের উলামারা যদি তাঁর বিশ্বাসের খন্ডন করতে না পারে তবে তাঁকে মুক্ত করে দিতে হবে। রাজা এতে সম্মত হলেন এবং কাবুলের জামিয়া মসজিদে সাহেবযাদা সাহেবের এবং উলামাদের এক জনসমাবেশের আয়োজন করলেন।

বিতর্ক–আলোচনার প্রহসনমূলক রায়

বির্তক অনুষ্ঠানের দিন নির্দিষ্ট সময়ে বহুলোক জামিয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে এসে সমাবেত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে হযরত সাহেবযাদা সাহেবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বিতর্ক অনুষ্ঠানে উপস্থিত করা হয়। বিতর্কের বিষয় ছিল প্রতিশ্রুত মসীহ্‌'র দাবী, 'জিহাদের তাৎপর্য' এবং 'যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু'। তিন দিন ধরে সাহেবযাদা সাহেব এবং উলামাদের মধ্যে আলোচনা চলে। আমীরের প্রধান ধর্মগুরু মোল্লা আবদুর রাজ্জাক খান বিপক্ষ দলের নেতৃত্ব দেন।

গুজরাট জেলার জালালপুর জাতনে'র অধিবাসী আহমদীয়া আন্দোলনের দু'জন প্রধান বিরুদ্ধবাদীকে উভয় পক্ষের হার-জিত নির্ধারণের জন্য বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই বিচারকদ্বয়ের প্রধান ছিলেন ড. আব্দুল গনি। তিনি আমীরের দরবারে বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং সরকারের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল ছিলেন।

আলোচনা সভার শেষ ভাগে বিপক্ষ দলের উলামারা যখন বুঝতে পারলেন যে, তাদের অবস্থা ক্রমেই নাজুক হয়ে আসছে, তখন তারা দ্রুত আলোচনা গুটিয়ে ফেলেন। এদিকে বাইরে জনসাধারণ আলোচনার ফলাফল জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। এমতাবস্থায়, বিচারকদ্বয় তাদের রায়ের অনুকূলে কোন যুক্তি প্রদর্শন না করেই নির্বিচারে সাহেবযাদা সাহেবকে পরাজিত ঘোষণা করেন। অজ্ঞ জনতার মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। তারা রাজকীয় সিদ্ধান্ত শ্রবণের জন্য রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। আমীর হাবীবুল্লাহ্‌ খানকে পূর্বেই ড. আব্দুল গনির রায় সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। ড. আব্‌দুল গনি হযরত সাহেবযাদা সাহেবকে একজন মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হিসেবে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু-দন্ডের রায় প্রদান করেন।

দু'টি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য

পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক কাবুল বিতর্কের জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী কোন এক কাজ উপলক্ষ্যে পেশোয়ার আসেন। ঘটনাক্রমে সীমান্ত প্রদেশের আমীর কাজী মোহাম্মদ ইউসুফে'র সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি জানান যে, বিতর্কে হযরত সাবেহযাদা সাহেব সম্পূর্ণভাবে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও সাধারণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। পক্ষান্তরে, তাঁর বিপক্ষ দলের পক্ষে দলীল-প্রমাণ বলতে কিছুই ছিল না এবং তাদের অধিকাংশ বক্তব্যই ছিল পরস্পর-বিরোধী। তিনি এ-ও স্বীকার করেন যে, হযরত সাহেবযাদা সাহেবের তুলনায় তাঁর বিপক্ষ দলের উলামাদের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত অল্প ও অগভীর।

ইউসুফজাই এলাকার বাগদাদার উপজাতীয় প্রধান খান বাহাদুর রিসালদার মুঘলবাজ খানও অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি স্বয়ং আলোচনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান যে, বিপক্ষ দলের প্রধান উলামা মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক নিজেও তার বক্তব্যে এ কথা স্বীকার করেছিলেন যে, সাহেবযাদা সাহেবের ন্যায় তাঁর এত গভীর জ্ঞান নেই এবং তিনি বিতর্কের ব্যাপারে তার বিপক্ষের ন্যায় এত অভিজ্ঞ নন।

রায় পরবর্তী ঘটনা

রাজা পুনরায় হযরত সাহেবযাদা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং উলামাদের রায় সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। হযরত সাহেবযাদা সাহেব রাজাকে এই মর্মে অনুরোধ করলেন যে, তিনি যেন অন্ততঃপক্ষে ব্যক্তিগতভাবে কাগজপত্রগুলো পড়ে দেখেন এবং তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু কাপুরুষ আমীর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করে দেখার জন্য কাগজপত্রগুলো তাদের কাছে চাওয়ার সাহস পেলেন না। কারণ তিনি ছিলেন মোল্লাদের হাতে একজন ক্ষমতাবিহীন নেতা মাত্র।

সাহেবযাদা সাহেবকে একজন মুরতাদ ঘোষণা করার ব্যাপারে সরদার নসরুল্লাহ্ খান বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। আমীর প্রতিশ্রুত মসীহ্কে অস্বীকার করার জন্য সাহেবযাদা সাহেবকে প্ররোচিত করতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেন। তিনি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি যদি উলামাদের উপস্থিতিতে মাত্র একবার স্বীকার করেন যে, তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্'র অনুসারী নন তবে তাঁকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে দেয়া হবে এবং ইচ্ছামত তিনি যে কোন দেশে স্বাধীনভাবে চলে যেতে পারবেন। কিন্তু মহৎপ্রাণ সাহেবযাদা সাহেব কিছুতেই তা স্বীকার করলেন না বরং আমীর নসরুল্লাহ্ খান ও উলামাদের উপস্থিতিতে অতি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্'র বিরুদ্ধে কখনও একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারবেন না, বরং এরূপ করার চেয়ে তাঁর মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

অবশেষে রাজা তাঁকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর দন্ডাদেশে স্বাক্ষর করেন।

মিঃ এফ, এ, মারটিন নামক একজন আমেরিকান, যিনি আফগানিস্তানে বহু বছর প্রধান প্রকৌশলীর (Engineer) কাজ করে ছিলেন, তাঁর লেখা' Under the absolute Amir' পুস্তকে তিনি প্রস্তরাঘাতে নিহত করার শাস্তি সম্পর্কে নিম্নভাবে বর্ণনা করেনঃ

"ধর্ম সংক্রান্ত অপরাধসমূহের বিচার মোল্লাদের দ্বারা গঠিত এক জুরী দ্বারা মনোনীত একজন প্রধানের অধীনে করা হয়, যিনি তাদেরই মধ্য থেকে মনোনীত হন। ধর্মীয় প্রধান মোল্লারা কোনও ব্যক্তিকে অপরাধের জন্য প্রস্তারাঘাতে নিহত করার আদেশ দিতে পারে কিন্তু এই দন্ডাদেশ আমীর কর্তৃক অনুমোদিত হ'তে হয়। অপরাধীর হাত পিছনের দিকে শক্ত করে বেঁধে তার পায়ে শৃঙ্খল পড়িয়ে শহরের খোলা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মোল্লাদের কিছু লোক তার পিছে পিছে যেতে থাকে এবং একটি নির্ধারিত স্থানে তাদের প্রধান মোল্লা কর্তৃক প্রথম প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয়। জনসমাবেশে যোগদানকারীরা যে পর্যন্ত প্রধান মোল্লা কর্তৃক প্রস্তর নিক্ষেপিত না হয়, ততক্ষণ তারা প্রস্তর নিক্ষেপে বিরত থাকে। তারপর তারাও প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করে। দন্ডিত ব্যক্তির উপর বৃষ্টিধারার ন্যায় প্রস্তর নিক্ষেপিত হ'তে থাকে । এই প্রস্তর নিক্ষেপ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিরামহীন প্রস্তারাঘাতের ফলে তীব্র বেদনায় অপরাধী নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

"এরূপেই ১৯০৩ সালের ১৪ই জুলাই, ১৩২১ হিজরীর ১৭ই রবিউস্‌সানী হযরত সাহেবযাদা সাহেবকে কাবুলের নিকটবর্তী বালাসর প্রাসাদের দক্ষিণপ্রান্তে এক পুরাতন সামাধিস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সমাধিস্থলে ধনী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমাহিত করা হ'ত। তাঁর হাত পা শিকল দিয়ে শক্তভাবে বাঁধা এবং তাঁর চারদিকে জনতার এক বিরাট মিছিল (Procession) ছিল। তার গ্রীবাদেশে তার মৃত্যুদন্ড ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। অত:পর জনতা মিছিল সহকারে সমাধিস্থলে পৌছালে তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার জন্য আড়াই ফুট এক গভীর গর্ত খনন করে তন্মধ্যে সাহেবযাদা সাহেবের অর্ধেক দেহ প্রোথিত করা হয়।

আমীর সরদার নসরুল্লাহ্ ও প্রধান মোল্লা মিছিলে সামিল হন। প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্বে রাজা একবার সাহেবযাদা সাহেবের নিকট যান এবং তাঁকে জীবন বাঁচানোর জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে অস্বীকার করাতে তাগিদ দেন। কিন্তু হযরত সাহেবযাদা সাহেব দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে মাটি গর্ভে প্রোথিত অবস্থায় তিনি উচ্চস্বরে নিম্ন কলেমা পাঠ করেনঃ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর প্রেরিত রসূল"।

তিনি যখন এ কলেমা পাঠ করছিলেন, তখন মোল্লা আব্দুর্ রাজ্জাক হযরত সাহেবযাদা সাহেবের মস্তক লক্ষ্য করে একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করেন এবং বলেন যে, যে কেউ এই ধর্মত্যাগীকে প্রস্তর নিক্ষেপ করবে সে-ই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। তারপর সর্দার নসরুল্লাহ্ খানের নিক্ষিপ্ত একটি প্রস্তর হযরত সাহেবযাদা সাহেবের মস্তকে এসে আঘাত করলে তিনি কা'বার প্রতি মুখ করে পুনঃ পবিত্র কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করেনঃ "হে আল্লাহ্! তুমি ইহ-জগতে এবং পরজগতে আমার অভিভাবক। আমাকে তুমি একজন সত্যিকার মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দাও এবং সৎ-কর্মশীল ব্যক্তিদের দলের অন্তর্ভুক্ত কর।" যখন তিনি এই আয়াত পাঠ করছিলেন তখন বৃষ্টি ধারার ন্যায় তাঁর উপর প্রস্তর নিক্ষেপ হচ্ছিল। আর এভাবেই তিনি মোল্লা ও কাবুলীদের দ্বারা নিক্ষেপিত প্রস্ত রস্তুপের নীচে সমাধিস্থ হয়ে আত্মাহুতি দেন।

হযরত সাহেবযাদা সাহেব মোল্লাদের দ্বারা প্রস্তরাঘাতে নিহত হয়ে হযরত আহমদের (আঃ) ইলহামের 'দু'টি ছাগ জবাই' সংক্রান্ত আল্লাহ্‌তালার বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করে। শত শত মাইল দূরে আল্লাহ্‌তাআলা ইলহামের মাধ্যমে হযরত আহমদ (আঃ) -কে এই ঘটনার সংবাদ দেন। তার নিকট ইলহাম হয়, "অত্যাচারিত ও নিপীড়িত একজনকে এমন অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে যে, তিনি কি বলেছেন জনসাধারণ তা শুনতে পারে নি"। আলোচনার লিখিত বক্তব্যও কোনদিন জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় নি। দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আমীর নিজেও জানত না যে, বির্তকে কি কি কথোপ-কথন হয়েছিল।

আল্লাহ্‌তাআলার ক্রোধাগ্নি

হযরত সাহেবযাদা সাহেবের নির্মম হত্যাকান্ডের পর ২৪ ঘন্টাও অতিক্রান্ত হ'ল না, আফগানিস্তানের আকাশ আল্লাহ্‌তাআলার গযবের ফিরিশ্‌তাদের দ্বারা প্রকম্পিত হ'ল। গযবের ফিরিশ্‌তারা হত্যাকারীদের নগরী কাবুলে কলেরার প্লাবনদ্বার খুলে দিল। এক রাতের মধ্যে কলেরা মহামারি আকারে দাবাগ্নির ন্যায় সমগ্র রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ল। আমীর হাবীবুল্লাকে কৃতকর্মের জন্য মাশুল দিতে হলো। নসরুল্লাখানের স্ত্রী, পুত্র এবং রাজপরিবারের বহু লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। পরিবারের পর পরিবার কলেরার কোপে নিপতিত হলো এবং চিকিৎসা লাভের সুযোগ পাওয়ার পূর্বেই ভবলীলা সাঙ্গ করলো। নগরীতে বিভীষিকা নেমে এলো। ক'দিনের মধ্যেই সমগ্র রাজধানী উজাড় হয়ে গেল। এত অধিক লোকের মৃত্যু হলো যে, তাদের কবর দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। শিয়াল, কুকুর, শুকুন রাস্তায় মৃত মানুষ ভক্ষণ করতে লাগলো। ক'দিনের মধ্যে কলেরায় কাবুলে আশি হাজারেরও অধিক মানুষের মৃত্যু হলো। পৃথিবীর ইতিহাসে কলেরার এমন ভয়াবহ নজীর আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ।

জানা যায়, তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি আমীর এবং সরদার নসরুল্লাহ্‌ খানের উপস্থিতিতে এক ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তাঁর মৃত্যুর ৬ দিন পরে সমগ্র আফগানিস্তানকে এক বিপদ কাটাতে হবে। এছাড়া তাঁর মৃত্যুকালে হঠাৎ এক ভয়াবহ ঝড়-ঝঞ্ঝা উঠে এবং আধ ঘণ্টা ধরে তা প্রবলভাবে আলোড়িত হয়; এরপর যেরূপ হঠাৎ উঠেছিল সেরূপ হঠাৎ থেমে যায় এবং সত্য সত্যই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলার ক্রোধাগ্নি নিরপরাধ সাহেবযাদা সাহেবের মৃত্যুর প্রতিশোধে আফগানিস্তানে নিম্নোক্ত পন্থায় নিপতিত হয়।

"প্রধান অপরাধী সরদার নসরুল্লাহ্‌ খান তার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী ও তার একমাত্র পুত্র কলেরায় মারা গেলে মানসিক বেদনায় ভেঙ্গে পড়েন। কিন্তু তখনও তার ভাগ্যে অধিকতর বিপদ থেকে যায়।

১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী'র মধ্যে ভাগে সর্দার নসরুল্লাহ্‌ খান তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমীর হাবীবুল্লাহ্‌ খানের সাথে জালাবাদের পূর্বাঞ্চল সিরোতে শিকারে গমন করেন। সেখানে ২০শে ফেব্রুয়ারী রাতের আঁধারে অজ্ঞাত নামা এক আততায়ীর হাতে আমীর হাবীবুল্লাহ্‌ খান নিহত হন। পরদিন সর্দার নসরুল্লাহ্‌ খান সিংহাসনের উত্তরাধিকারী

আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র এনায়েতুল্লাহ্ খানের অধিকার অগ্রাহ্য করে ১৯১৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী জালাবাদে নিজেকে দেশের সর্বময় শাসনকর্তা বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় সৈন্যবাহিনী এবং কতিপয় সরকারী কর্মকর্তা তার আনুগত্য স্বীকার করে। ভারতে বৃটিশ সরকারকে তার সিংহাসন আরোহণের কথা অবহিত করা হয়।

এদিকে আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের তৃতীয় পুত্র কাবুলের গর্ভনর আমানুল্লাহ্ খান তৎক্ষণাৎ সকল কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে ডেকে পাঠান। তাদের কাছে আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের মৃত্যুর ঘটনা এবং নসরুল্লাহ্ খানের সিংহাসনের অধিকারের খবর পেশ করেন। তারা সবাই আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের হত্যার জন্য নসরুল্লাহ্ খানকে দায়ী করেন। আমানুল্লাহ্ খান পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাদের সাহায্য কামনা করেন। সবাই তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাকে নতুন আমীর হিসেবে স্বীকার করেন।

আমীর আমানুল্লাহ্ খানের মোকাবেলায় যে সব সরকারী কর্মকর্তা নসরুল্লাহ্ খানের আনুগত্য স্বীকার করেছিল, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন ও তাদের পরিবারবর্গকে গ্রেফতার করেন।

ইতোমধ্যে নসরুল্লাহ্ খান, এনায়েতুল্লাহ্ খান এবং সেনাদলের কমান্ডার মোহাম্মদ হোসেনের ক্ষমতাচ্যুতির কথা ঘোষণা করা হয়। তাদের গ্রেফতারের জন্য পরোয়ানা জারি করে তিন জনকেই গ্রেফতার করা হয় এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আমানুল্লাহ্ খানের সামনে আনা হয়। মোহাম্মদ হোসেনকে সাথে সাথে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। নসরুল্লাহ্ খান, এনায়েতুল্লাহ্ খান এবং হায়াতুল্লাহ্ খান (আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের দ্বিতীয় পুত্র) সকলকে রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী কারাগারে বন্দী রাখা হয়।

অতপরঃ ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল সর্দার নসরুল্লাহ্ খান ভাতিজা আমানুল্লাহ্ খান কর্তৃক আজীবন কারাদন্ডে দণ্ডিত হন। বন্দী অবস্থায় দুঃখ-কষ্টে তিনি পাগল হয়ে যান। অবশেষে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ সম্বন্ধে স্যার পারসী সাইকস তাঁর পুস্তক "আফগানিস্তানের ইতিহাস" (History of Afghanistan) ২৬৮ পৃষ্ঠায় লিখেনঃ

"১৩ই এপ্রিল এক গণদরবারে নসরুল্লাহ্ খান সাবেক আমীরকে খুন করার জন্য প্ররোচিত করায় অপরাধী ঘোষিত হয় এবং তাকে আজীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। পরে অল্পকালের মধ্যেই নসরুল্লাহ্ খান শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তার মৃত্যু সংবাদ ক'মাস পর্যন্ত প্রচারিতই হয় নি।"

এই নসরুল্লাহ্ খানের নির্দেশেই হযরত আব্দুল লতীফ সাহেবকে খুশ্‌ত থেকে গ্রেফতার করে কঠোরভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কাবুল আনা হয়েছিল, এবং কারাগারের ক্ষুদ্র ও নির্জ্জন কক্ষে বন্দী রাখা হয়েছিল। আল্লাহ্‌তাআলাও একইভাবে নসরুল্লাহ্ খানকে লাঞ্ছিত করে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন।

এখানে উল্লেখ যোগ্য যে, নসরুল্লাহ্ খান হযরত সাহেবযাদার অখণ্ড সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তার পরিবারবর্গকে অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টে ফেলে ছিলেন তারই নির্দ্দেশে ১৯০৩ সালের জুলাই মাসে হযরত সাহেবযাদার সমগ্র পরিবারকে তুর্কীস্তানে নির্বাসিত করা হয়। ১৯১১ সালে পুনরায় নির্বাসিত এই পরিবারকে কাবুলে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হয়। এই বার কাবুলে ফিরে আসার পরও হযরত সাহেবযাদার পরিবারের উপর নসরুল্লাহ্ খানের অত্যাচার অব্যাহত থাকে। সমগ্র পরিবারকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়

এবং প্রত্যহ তাদেরকে নগর পুলিশের নিকট হাজিরা দিতে বাধ্য করা হয়। পরে নসরুল্লাহ্ খানের নির্দ্দেশে হযরত সাহেবযাদা সাহেবের পাঁচ পুত্রকেই গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। সাহেবযাদা মুহাম্মদ ওমরজান এবং সাহেবযাদা মুহাম্মদ সাঈদজান করাগারে জরাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং কারাগারের রুদ্ধ আবহাওয়াতেই বিনা চিকিৎসায় তাদের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। কিন্তু নসরুল্লাহ্ খান জানত না যে, তার ভাগ্যেও একই দুর্ভোগ অপেক্ষা করছিল। আমানুল্লাহ্ খান কর্তৃক বন্দী হওয়ার পর কারাগারের নির্জন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তিলে তিলে হযরত সাহেবযাদা ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে তাকেও শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করতে হয়।

উল্লেখ্য যে, হযরত আব্দুল লতীফকে হত্যার কিছুক্ষণ পর খুশ্‌তের আহমদ নূর এবং মোল্লা মির তার লাশ প্রস্তর স্তূপ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে একটি বাক্সে করে অন্য একটি সামাধিস্থলে দাফন করেন। তারপর আবার কদিন পর তারা সেই লাশ উঠিয়ে নিয়ে খুশ্‌তে স্থায়ীভাবে দাফন করেন। নসরুল্লা খান একথা জানতে পেরে হযরত সাহেবযাদার লাশকে অজ্ঞাত স্থানে সরিয়ে ফেলার জন্য খুশ্‌তের গবর্নর শাহ ঘাসি মোহাম্মদ আকবর খানের নিকট এক নির্দ্দেশ প্রেরণ করেন। খুশ্‌তের গভর্ণর তার সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। আর নসরুল্লাহ্ খানের অভিশপ্ত মৃত্যু হলে আল্লাহ্‌তাআলাও তার কবরের চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন। নসরুল্লাহ্ খানের কবর কোথায়, তা আজ কাবুলের একটি লোকও দেখিয়ে দিতে পারবে না।

বস্তুত নসরুল্লাহ্ খান একজন দুরাত্মা হিসাবে মৃত্যু বরণ করেন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র কলেরার শিকারে পরিণত হয়। তার স্ত্রী তার চোখের সামনে কাতরাতে কাতরাতে মারা যায়, কিন্তু তখন তার করার কিছুই ছিল না। তার দ্বিতীয় পুত্রকে ১৯২০ সালে আমীর আমানুল্লাহ্ খানের নির্দেশে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। তার কন্যা, যাকে আমানুল্লাহ্ খান রাণী সুরাইয়ার অগোচরে গোপনে বিয়ে করেছিলেন, তাকে তালাক দেয়া হয়। এভাবে নসরুল্লাহ্ খান নিজে এবং তার সমগ্র পরিবার তার কৃতকর্মের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলার কোপানলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

হায়াতুল্লাহ্ খানকে বাচ্চা সাক্কা হত্যা করে। সে দেশে আমানুল্লাহ্ খানের অনুপস্থিতিতে সিংহাসন দখল করেছিল। তাকে গোপনে রাজপ্রাসাদের দেওয়ালের নীচে কবর দেওয়া হয়। আল্লাহ্‌তাআলার ক্রোধে নিপতিত হয়ে এভাবে কাবুলের সমগ্র রাজ পরিবার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। আমীর আবদুর রহমান হযরত মৌলবী আব্দুর রহমানের হত্যার দ্বারা এর ভিত্তি রচনা করেছিলেন। তার পুত্র হাবীবুল্লা খান পুনরায় হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফকে হত্যার নির্দ্দেশ দিয়ে সমগ্র রাজ পরিবারের আশু ধ্বংস ডেকে আনেন। আহমদীদের উপর অত্যাচারের জন্য আমীর আমানুল্লাহ্‌কেও সিংহাসন হারাতে হয়। অবশেষে আমীর আমানুল্লাহ্ সিংহাসন থেকে বিতাড়িত এবং নিজ দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে ইতালীতে একজন সামান্য চায়ের দোকানের মালিক হিসেবে বসবাস করতে শুরু করে এবং সেখানে সে অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়। রাণী সুরাইয়াও ইতালীতে একটি ক্ষুদ্র ভারাটিয়া কক্ষে অতি অনাড়ম্বর পরিবেশে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

এখন আমরা দ্বিতীয় অপরাধী, অর্থাৎ স্বয়ং আমীরের ভাগ্যে কি ঘটেছিল তার উল্লেখ করবো। কলেরা মহামারীতে রাজপরিবারে বহুলোকের ভীতিপ্রদ মৃত্যুতে আমীর হাবীবুল্লাহ্ একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিলেন। এরপর থেকে তিনি তার রাজত্বের ধ্বংসের

পালা স্বচোখে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তা রক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারছিলেন না। ১৯০৭ সালে তিনি এক রাষ্ট্রীয় সফরে ব্রিটিশ ভারতে গমন করেন। এতে কাবুলের মোল্লারা তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায় এবং তাকে ধর্মত্যাগী– মুরতাদ বলে ঘোষণা করে। তার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে তুমুল আন্দোলন ও সমালোচনা শুরু হয়। আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এতে তার পতন অত্যাসন্ন হয়ে পড়ে।

আমি আবারও স্যার পারসী সাইকস-এর History of Afghanistan (Page 266) থেকে উদ্ধৃতি দেবোঃ

"আমীর, যিনি খেলাধূলায় অনুরক্ত ছিলেন এবং বিশেষ করে পাখী শিকারে, এ উদ্দেশ্যে মোসাহিবীন (Musahibeen) পরিবারের আহমদ শাহ খানের পরিচালনাধীন একদল সৈন্য সমভিব্যহারে লাঘমেনে (Laghman) যান.....।" (সেখানে শিলাঘোষ নামক স্থানে ক'দিনের জন্য রাজকীয় শিকারী দল শিবির স্থাপন করে। ঐ সময়ে এক রাতে আমীর ও রাণী যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তখন শিবিরের কঠোর প্রহরা ভেদ করে অজ্ঞাত আততায়ী তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করে এবং আমীরের মস্তক লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলি নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়। গুলিতে আমীরের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু ঘটনার পর আতাতায়ীর সন্ধান পাওয়া যায় নি।) "১৯১৯ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী সকাল বেলায় ইহা প্রকাশিত হয় যে, একজন অজ্ঞাত আতাতায়ী তার তাবুতে প্রবেশ করে এবং তার কানের মধ্যে গুলিবিদ্ধ করে। ইহা কি আল্লাহ্তাআলার ক্রোধাগ্নির জ্বলন্ত প্রমাণ নয় যে, একজন রাষ্ট্রনায়ক পূর্ণ পাহারা পরিবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যায় অথচ গুপ্তঘাতককে ধরা যায় নি?"

এভাবে আমীর স্বীয় মস্তক দিয়ে হযরত সাহেবযাদা সাহেবের মস্তকের প্রায়শ্চিত্ত করেন। তারই নির্দেশে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হযরত সাবেহযাদা সাহেবের মস্তক গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। নিহত আমীরকে জালালাবাদে সমাহিত করা হয়। কিন্তু ইতিহাস এখানেই থেমে থাকে না। আমীরকে হত্যার কিছুদিন পর শিনওরার বিদ্রোহীরা জালালাবাদ আক্রমণ করে। তারা আমীর হাবীবুল্লাহ্র প্রতি খুবই বিরূপ ছিল। জালালাবাদ পৌঁছে তারা নিহত আমীরে প্রতি তাদের ঘৃণা প্রকাশের জন্য তার কবরে প্রস্তর বর্ষণ করে। আফগানিস্তানের ইতিহাসে এসব ঘটনা সংরক্ষিত হয়ে আছে। আমীর হাবীবুল্লাহ্র নির্দেশে সাহেবযাদা আব্দুল লতীফের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল। আর আল্লাহ্তাআলার নির্দেশে নিহত আমীরের কবরে প্রস্তর বর্ষিত হলো।

তৃতীয় অপরাধী ছিল ডঃ আব্দুল গনি। তার বাড়ী ছিল তদানিন্তন বৃটিশ ভারতের গুজরাট জেলায়। তিনি তার অপর দুই ভাইসহ ভাগ্যের অন্বেষণে কাবুল আগমন করেন। ধীরে ধীরে তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কাবুলের রাজ মহলে তিনি বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠেন। কাবুলের আমীর বিভিন্ন ব্যাপারে তার মতামত গ্রহণ করতেন। সাহেবযাদা হযরত আব্দুল লতীফ এবং মোল্লাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রহসনমূলক বিতর্কে তাকে বিচারক নিযুক্ত করা হয়। ড. আবদুল গনি প্রকাশ্যভাবে মোল্লাদের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং হযরত আব্দুল লতীফের বক্তব্য বিবেচনা না করে এক তরফাভাবে মোল্লাদের পক্ষে রায় প্রদান করেন। এই ঘটনার পর তার উপর ধীরে ধীরে আল্লাহ্তাআলার গযব নেমে আসে। আমীর তাকে রাষ্ট্রীয় কাজে পরামর্শ দানের

জন্য একটি মজলিশে শূরা (প্রধান উপদেষ্টা কমিটি) গঠন করেন। ড. আবদুল গনিকে এর সদস্য নিযুক্ত করা হয়। আমীর কিছু দিনের মধ্যেই আবিষ্কার করেন যে, উপদেষ্টা কমিটি তাদের হাতে অধিক ক্ষমতা নিয়ে ফেলেছে এবং কেবল ক্ষমতাই নয়, তার জীবন নাশের ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত রয়েছে। তিনি অবিলম্বে উপদেষ্টা কমিটি ভেঙ্গে দেন এবং সূরার সকল সদস্যদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। ড. আবদুল গনি এবং তার ভাইদের এগার বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। এটা ছিল ডক্টরের প্রাপ্ত প্রাথমিক শাস্তি। তাকে আরও শাস্তি ঘিরে ধরে। সে দ্বিতীয় শাস্তি পায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তার স্ত্রী স্বদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য মনস্থির করে। দেশে ফেরার সময় লাণ্ডিকোটালে তার রহস্যজনক মৃত্যু হয়। স্থানীয় জনসাধারণ চাঁদা তুলে এই মহিলাকে দাফন করে। তার তৃতীয় শাস্তি ছিল যে, তার যৌবনদীপ্ত পুত্র আব্দুল জব্বার কাবুলে মুদির দোকান থেকে জিনিসপত্র ক্রয়ের জন্য বাজারে গমন করে। পথিমধ্যে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তাকে হত্যা করে। কাবুল বাজারের প্রত্যক্ষদর্শীরা কোন দিন তার আততায়ীর সন্ধান দেয় নি।

কারাভোগের পর ড. আবদুল গনিকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে নিজ গ্রামে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চরম দুর্দশার মধ্যে কাটিয়ে তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে। তার চতুর্থ শাস্তি ছিল, তার দ্বিতীয় পুত্র একজন টঙ্গা চালক ছিল। সে একটি ঘোড়ার গাড়ী চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। এভাবে, আল্লাহ্তাআলা তাকে এবং তার সমগ্র পরিবারকে উন্নতির চরম শিখর থেকে অবনতির অতল গহ্বরে ফেলে দেন।

ড. আবদুল গনির এক ভাই নজফ আলী কারাভোগের পর কাবুলের মোল্লাদের বিরুদ্ধে একটি পুস্তক রচনা করে। মোল্লারা তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। নাদির শাহ বিষয়টি প্রধান কাযীর নিকট প্রেরণ করেন। কাযী তাকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু দণ্ডের নির্দেশ দেন। কিন্তু কাবুলের বৃটিশ দূতাবাস বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে এবং তার মুক্তির জন্য দাবী জানায়। পরে তাকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

মোল্লা আবদুর রাজ্জাক

কাবুলের যে কোন ধর্মীয় বিষয়ে মোল্লা আবদুর রাজ্জাকের মতামত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হ'ত। আমীর একবার নির্দেশ জারী করলেন যে, সড়ক বা রাজপথে চলার সময় প্রত্যেককে বাম দিকে ঘেঁসে চলতে হবে। একদিন আমীর রাজপথ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন যে, একজন পুলিশ মোল্লা সাহেবকে থামাবার চেষ্টা করছে। কারণ মোল্লা সাহেব সড়কের দক্ষিণ পাশ ঘেঁষে পথ চলছিল। নিজের পদ মর্যাদার কথা চিন্তা করে মোল্লা সাহেব পুলিশের কথায় কর্ণপাত করছিলেন না। আমীর এই ঘটনা স্বচোখে দেখার পর মোল্লাকে এক হাজার টাকা জরিমানা করলেন। কিছুদিন পর আমীর মোল্লা রাজ্জাককে তার ঔদ্ধত্যের জন্য কঠোর শাস্তি দিলেন। তাকে প্রতিদিন পুলিশের নিকট হাজিরা দিতে হতো। আমীরের রোষে পড়ে মোল্লা সাহেব অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'তে লাগলেন। অবশেষে একদিন তিনি রাতের অন্ধকারে কোন এক অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশ্য পাড়ি জমালেন। পরে কেউই তার আর কোন খবর পায় নি। এভাবে আল্লাহ্তাআলার ক্রোধকে প্রজ্জলিত করে মোল্লা আব্দুর রাজ্জাকের ন্যায় প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ধর্মীয় গুরুকেও মোল্লাদের রাজত্ব কাবুল থেকে লাঞ্ছিত অবস্থায় লোক চক্ষুর অন্তরালে চির বিদায় নিতে হ'ল।

উপসংহারে, আমরা আফগানিস্তানের আমীরের প্রধান প্রকৌশলী ইত:পূবে উল্লেখিত আমেরিকান মিঃ এফ, এ, মার্টিন কর্তৃক সাহেবযাদা সাহেবের শাহাদত বরণ সম্পর্কে একটি বর্ণনার উল্লেখ করবোঃ

যেহেতু আমীর দেশাভ্যন্তরে দূরপাল্লায় যাতায়াত করতেন না। সরদার নসরুল্লাহ্ খানও স্বভাবতই তার শহর ভবনে থাকতে বাধ্য থাকতেন এবং তার অধিকাংশ সময়ই নামাযের বিছানায় কাটত, তাদের সহচররা আমাকে এরূপই জানিয়েছিল। তার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মুত্যুমুখে পতিত হলে সে তার বিরহ শোকে এবং পরে নিজেও উক্ত রোগের শিকারে পতিত হওয়ার ভয়ে পাগল প্রায় হয়ে যায় বলে বর্ণনা পাওয়া যায়।

অন্য এক কারণে সৃষ্ট এই সরদারের ভয় এবং আমীরেরও তদ্রূপ ভয় ঐ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয়কে আরো বাড়িয়ে দেয় এবং এটা এভাবেই ঘটে- দেশের মোল্লাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী এবং প্রধান ব্যক্তিদের একজন বছরের প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৯০৩ সালে মক্কায় হজ্জ সমাপনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ভারতের মধ্য দিয়ে তিনি সমুদ্র বন্দরে যান, সেখান থেকে জাহাজ যোগে মদীনা যেতে মনস্থ করার সময় তিনি শুনতে পেলেন, একজন পবিত্র মানব যিনি মসীহ্'র দ্বিতীয় আগমনের প্রচার করছেন- যিনি এরূপ প্রচার করেন যে, তিনি অপর এক সাধু যোহনের ন্যায়, মসীহ'র আগমনের পথ সুগম করে তাঁর আগমনের কথা জানাতে প্রেরিত হয়েছেন। মোল্লা এ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন- যার সম্পর্কে স্থানীয় লোকজন বহু আশ্চর্যজনক ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়ে থাকে এবং নিজেকে নবী বলে বিশ্বাসী ব্যক্তির দাবি-দাওয়া এতই বিশ্বাসযোগ্য যে, এ মোল্লা সাহেব তার দীক্ষা গ্রহণ করলেন এবং তিনি যা-ই হওয়ার দাবি করলেন তৎসমুদয়েই তিনি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করলেন। একদিন, ইহা জানা গেল যে, মোল্লা সাহেব হজ্জ সমাপন করতে যাচ্ছিলেন এমন সময় নবী (সঃ) তাকে ভিতরের কক্ষে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে, পরে মোল্লা সাহেবের বর্ণনানুযায়ী দু'জন একত্রে মক্কা গমন করেন, পবিত্র মক্কায় হাজীদের ভীরের মধ্যে নিজেকেও দেখতে পান এবং অভ্যন্তরের দরবার দর্শন করেন। সেখানে যা দেখার আছে সবই দেখলেন এবং পবিত্র গৃহাভ্যন্তরে (inner sanctuary) প্রবেশপুর্বক তিনি সেখানকার বিভিন্ন স্থানসমূহে নির্দেশিত নামাযসমূহ আদায় করলেন। যাহোক, মোল্লা সাহেবের এই মতিভ্রমের পিছনে কোন সম্মোহন বিদ্যা (mesmeric)। অথবা অন্য কোন প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল কিনা, যা ভেবে দেখার বিষয় বটে।তবে মোল্লা সাহেব যে মক্কায় গমন করেছেন এবং একজন সত্য নবী যে তার পথপ্রদর্শন করেছেন তাঁর মৃত্যুও তাকে এই বিশ্বাস থেকে বিচলিত করতে পারে নি। মোহাম্মেদানদের বিশ্বাস যে, বিভিন্ন নবী কর্তৃক (মূসা মসীহ্) প্রচারিত ধর্মসমূহ সাময়িকভাবে কার্যকরী ছিল এবং অতঃপর আল্লাহ্ মানবজাতির প্রয়োজনানুযায়ী এক নতুন ধর্মের সূচনা করেন। এ কারণেই মসীহ্'র আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত ইহুদীদের ধর্ম সত্যধর্ম রূপে কার্যকর ছিল এবং মুহাম্মদ (সঃ)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত মসীহ্ প্রচারিত ধর্ম সত্য ধর্মরূপে পরিগণিত হ'ত।

অতএব এই নতুন (মতবাদের) ব্যক্তি তার ধর্মমত প্রচারিত হ'লে মুসলমানদের আকিদায় এক বিপর্যয় সৃষ্টি করে ফেলবে এবং একারণেও যে, তিনি প্রচার করেন যে, মুসলমান অবশ্যই খ্রিস্টানদেরকে নাস্তিক হিসেবে নয়, ভ্রাতৃ হিসেবে শ্রদ্ধা করবে।

ইংরেজ বা রুশ আগ্রাসনের বেলায় এই বিশ্বাস আমীরের প্রধান অস্ত্র 'জেহাদ বা 'ধর্মযুদ্ধকে' ব্যর্থ বা অকেজো করে ফেলবে। কাজেই আমীর তৎশ্রবণে মোল্লা সাহেবকে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন আর মোল্লা সাহেব আসার পথে ধর্মীয় নতুন মতবাদ প্রচার করতে করতে ফিরে আসেন; আর তিনি দেশের সীমানা অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সাথে সাথে তাঁকে বন্দী করে কাবুলে আনা হয়। এখানে তিনি আমীর কর্তৃক পরীক্ষিত হন এবং মোল্লা সাহেবের চৌকষপূর্ণ (জ্ঞানময়) উত্তরসমূহে সত্য ধর্মের (ইসলাম) বিরুদ্ধে কিছুই দেখতে পেলেন না যাতে তাকে ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) আখ্যায়িত করতে পারেন এবং এভাবে তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হওয়ার উপযুক্ত মনে করতে পারেন। কারণ কুরআনের শিক্ষানুযায়ী একজন মুসলমান স্বধর্মত্যাগী হলে অবশ্যই তাকে প্রস্তরাঘাতে নিহত হ'তে হবে। তাকে তখন পরীক্ষা করে দেখার জন্য সরদার নসরুল্লাহ্ খানের নিকট পাঠান হয়। নসরুল্লাহ্ খান তার ধর্মীয় জ্ঞানে একজন মোল্লার চেয়ে অধিক কিছু ছিল বলে বিবেচিত হতেন, কিন্তু এ নেতা তার নিজ মুখের যুক্তিতে তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন নি। তাই অতি জ্ঞানী বারজন মোল্লার এক জুরী গঠন করা হয়। তারাও অপরাধী ব্যক্তিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার করে এমন কিছুই বের করতে সমর্থ হয় নি, যাতে লোকটিকে নিহত করা যায়। তাই তারা এ ব্যাপারটি আমীরের নিকট পাঠালেন।

কিন্তু আমীর মনে করল লোকটিকে অবশ্যই দোষী সাব্যস্ত করতে হবে, আর তাই তাকে পুনঃ মোল্লাদের নিকট প্রেরণ করা হ'ল। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হ'ল যে, তাদেরকে অবশ্যই এ মর্মে কাগজ পত্রে সই করতে হবে যে, লোকটি স্বধর্মত্যাগী হয়ে গেছে এবং মৃত্যু দন্ড পাওয়ার উপযুক্ত। এবারও মোল্লাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই দৃঢ়তার সাথে এ কথাই বললেন যে, তাদের ধর্ম সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ের উপরেই তাকে তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ পাচ্ছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে দু'জন মোল্লা তার মৃত্যুর অনুকুলে রায় প্রদান করেন। এই মোল্লাদ্বয় সরদার নসরুল্লাহ খানের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন ছিল এবং সে পূর্বেই তাদের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করে রেখেছিল। এ মোল্লাদের রায়ের উপরই এ লোকটিকে অপরাধী সাব্যস্ত করে প্রস্তরাঘাতে নিহত করা হয়। আমার সম্মুখ থেকে নিহত করার উদ্দেশ্যে তাকে ধরে নেয়ার পূর্ব ক্ষণে মোল্লা সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এ দেশ এক ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হবে এবং আমীর ও সরদার উভয়েই কষ্টভোগ করবে। যেদিন মোল্লা সাহেবকে তারা হত্যা করে ঐ রাতেই ৯ ঘটিকার সময় হঠাৎ করে এক প্রবল ঝড় তুফান উঠে এবং প্রচন্ড কোপ ও ভয়াবহতার সাথে তা আধ ঘণ্টা স্থায়ী হয় এবং পরে যেভাবে হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ থেমে যায়। ঐ রাতে এরূপ ঝড়-তুফান সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক ছিল, তাই লোকেরা বলতে লাগল যে, ইহা ছিল (শহীদ) মোল্লা'র আত্মার চলে যাওয়ার নিদর্শন।

তারপর কলেরার প্রাদুর্ভাব শুরু হ'ল। পূর্ববর্তী কলেরা মহামারীর বিবেচনায় পরবর্তী চার বছরে এর পুনঃ প্রাদুর্ভাব হওয়ার কথা ছিল না। তাই একে মোল্লা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণীর আংশিক পরিপূর্ণতা বলে বিবেচনা করা হ'ল। এ কারণেই আমীর এবং নসরুল্লাহ্ খানের মধ্যে ভীষণ ভয়ের উদ্রেক হ'ল এবং এসব আলামতের মধ্যেই যেন তারা নিজেদের মৃত্যু দেখতে পেল বলে মনে করল। এ কারণে নসরুল্লাহ্ খান তার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী বিয়োগে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। নিহত মোল্লা এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, তাঁর বিশাল ও শক্তিশালী এক অনুসারী দল ছিল, ফলে যে মোল্লাদ্বয়

তাঁর মৃত্যুর রায় দিয়েছিল তারা তাঁর অনুসারী দলের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের বিরামহীন ভীতির মধ্যে কালাতিপাত করতে লাগল কারণ শহীদের অনুসারীবৃন্দ তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ নিয়েছিল। তাদের একজন কলেরায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি পতিত হয়।

তাঁর পরিবারের ভাগ্য বিবরণ

প্রস্তরাঘাতে সৈয়্যদ আব্দুল লতীফ (রাঃ)-এর মৃত্যুবরণের পর সর্বমোট প্রায় একশ' সদস্য সম্বলিত তাঁর সমস্ত পরিবারকে অস্ত্রধারী এক সামরিক দলের পাহারায় কাবুলে আনা হয়। তখন ছিল শীতের প্রারম্ভ এবং টচিবাগে (Tochi Bagh) তাদেরকে প্রায় ৬ সপ্তাহকাল তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। তৎপর তারা তুর্কীস্থানে নির্বাসিত হয়। ঠান্ডা ও ঝড়ো আবহাওয়ার প্রচন্ডতা থেকে তাদের সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না এবং তাদের এ সফরে দারুন ক্লেশ ভোগ করতে হয়। তুর্কীস্তানে আগমনের পর শহীদ পরিবারের জন্য কিছু পরিমাণ ভূমি মঞ্জুর করা হয়। এ ভূমি থেকে লব্ধ আয় তাদের ভরণপোষণের জন্য নেহায়েৎ অল্প ছিল কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাদের পরিবারের একজন সদস্য যিনি ঘটনাচক্রে তাদের গ্রেপ্তারের সময় (ব্রিটিশ শাসনাধীন) বানু জিলায় থেকে রক্ষা পান, তিনি তাদেরকে সাহায্য করেন। ঐ একশ' জীবন প্রায় সাত বছর তুর্কীস্তানে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় দিনাতিপাত করেন। এই সময় অতিবাহিত হওয়ায় পর খুশ্‌ত প্রদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সরকারের নিকট তাদের উদ্ধারকল্পে একটি আবেদন জানান। যেহেতু তারা সৈয়্যদ বংশের লোক হিসেবে দেশে সকল প্রকারের সম্মান ও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে এবং একারণেও যে, পরিবারের সদস্যগণ আহমদীয়ত সম্বন্ধে কিছুই অবগত নয়, যার জন্য তাদের নেতা প্রস্তরাঘাতে নিহত হন।

আফগানিস্তানের তদানীন্তন আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান এই দরখাস্ত মঞ্জুর করলেন এবং যে মাতৃভূমি থেকে তারা নির্বাসিত হয়েছিল সেখানে তাদেরকে ফিরে এসে বসবাস করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাদের বাজেয়াপ্ত ভূসম্পত্তি তাদেরকে ফেরত দেয়া হ'ল না। তবে ৬ মাস পরে যারা আহমদীয়তে বিশ্বাসী নয় তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়া হ'ল। তবুও শহীদের ছেলেদেরকে কিছুই ফিরিয়ে দেয়া হ'ল না। এতে নসরুল্লাহ্ খানের প্রদর্শিত যুক্তি ছিল যে, তাদের বিশাল ভূ-সম্পতি রয়েছে। যেহেতু ঐ জেলায় এক বিরাট সংখ্যক জনতা এ পরিবারকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখে সেহেতু সরকার এ পরিস্থিতিতে চৌদ্দটি প্রাণকে পুনঃ কাবুলে সরিয়ে পৃথক তত্ত্বাবধানে রাখা সমচীন মনে করল। যাতে তাদের শুভাকাঙ্খীদল তাদের শোচনীয় পরিস্থিতি দর্শনে কোনরূপ অনর্থ ঘটাতে না পারে। তাদের থাকার কক্ষগুলো এত ছোট ছিল যে, সেখানে তাদের সকলের মোটেই স্থান সংকুলান হতো না, ফলে তাদের পরিচারকদের জন্য সরকারের নিকট কোনভাবে পৃথক থাকার ব্যবস্থা করার আবেদন জানান হয় কিন্তু সরকার এ প্রার্থনা মঞ্জুর করল না। তারা নিজেরাই নিজেদের থাকার ব্যবস্থা করে নিলেন। তারা সপ্তাহে দু'বার বাধ্যতামুলকভাবে থানায় উপস্থিত হত এবং সর্বদা তাদের উপর কড়া পাহারা রাখা হত, তারা যেন বিশেষ অপরাধী ছিল। এই দুর্বাগ্যবান নির্যাতন ভোগকারীদেরকে সুদীর্ঘ ৫ বছরকাল ঐ অবমাননাকর পরিস্থিতিতে রাখা হয়। এ সময়ের শেষভাগে পাঞ্জাবের ফযল

করীম গুজরাটি নামে এক ব্যক্তি কাবুলে আসেন এবং তিনি একজন আহমদী হওয়ায় সরকার তাকে গ্রেফতার করে। এ শহরে তার পরিচিত আরও কোন আহমদী আছে কিনা এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি শহীদ সাহেবযাদার ৫ পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের নাম উল্লেখ করেন, যারা তাদের সাথে মেহমান হিসেবে বসবাস করছে।

এর ফলে, তাদের অপমর্যদা আরো বাড়ানোর মানসে তাদেরকে তৎক্ষণাৎ কারাগারে প্রেরণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়। অসহিষ্ণুতা ও ধর্মান্ধতার শিকার এ নিরীহ ও নিরপরাধ প্রাণগুলোর প্রতি তাদের প্রদর্শিত আচার-ব্যবহার এতই অমানবিক ও বর্বরোচিত ছিল যে, তাদের মৃত মায়ের চেহারা দর্শনের জন্যও তাদেরকে অনুমতি প্রদান করা হয় নি। অধিকন্তু তাদের মায়ের দাফন-কাফন সম্পাদন করার জন্য (সেখানে এ কাজের জন্য কোন লোক বর্তমান না থাকায়) তারা অনুমতিদানের প্রার্থনা জানালে, মাত্র বড় ছেলেকে গিয়ে তাদের মাকে সমাধিস্থ করার অনুমতি দেয়া হয়। এরূপ নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতনের মধ্যে তারা উপর্যুপরি আটটি মাস কাটান এবং এ সময়টির মধ্যে কখনও তাদেরকে উপযুক্ত খাদ্যও প্রদান করা হয় নি।

যাহোক, পরিশেষে তাদের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তারা সরদার আমানুল্লাহ্ খানের এক সচিবকে কোনক্রমে তিনশত টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করলেন, তিনি তার সুপারিশে অসহায় কারাবন্দীদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে সাহায্য করলেন। তাদেরকে কারারুদ্ধ থাকার সময়ে যে পরিমাণ নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা হয়েছিল তার খানিকটা এ ঘটনার দ্বারাই কল্পনা করা যায় যে, স্বর্গবাসী শহীদের পুত্রদের একজন সৈয়্যদ মুহাম্মদ উমর কারাগারে দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করতে না পেরে অবশেষে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সকলের স্বাস্থ্যই চিরতরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাঈদ, স্বর্গবাসী শহীদের জ্যেষ্ঠ পুত্রও কারামুক্ত হওয়ার এক বছর পরেই মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর দু'সপ্তাহের মধ্যেই আমীর হাবীবুল্লাহ খান খুন হন এবং আমীর আমানুল্লাহ খান আফগানিস্তানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আমানুল্লাহ খানের শাসনামলের প্রারম্ভে তাদের খুশ্‌ত প্রদেশবাসী বাবারক খান নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে এ অসহায় লোকদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের জন্য পুনঃ আবেদন করা হয় এবং আমীর ইহা শুধু মঞ্জুরই করেন না অধিকন্তু তাদের ভূসম্পত্তি তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ প্রদান করেন।

এভাবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে অবশিষ্ট শহীদ পরিবার তুলনামূলকভাবে অধিকতর শান্তিতে প্রায় চার বছর কাল অতিবাহিত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমানুল্লাহ্ খানের বিরুদ্ধে দেশে রাষ্ট্রদ্রোহিতা শুরু হয়ে যায় এবং তাঁর কৃতজ্ঞতায় তার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে তারা নেহায়েত তৎপরতার সাথে সরকারকে সাহায্য করতে থাকেন। এ ঘটনা চলাকালে বিদ্রোহীরা তাদের সুযোগ গ্রহণ করে এবং এ পরিবারের অনুপস্থিতিতে তাদের ঘরসমূহে অগ্নিসংযোগ করে। তাদের ফলের বাগানসমূহ পুড়িয়ে দেয় এবং সার্বিকভাবে তাদের সম্পত্তি ধ্বংস করে ফেলে। এই বিদ্রোহীদের একমাত্র ওজর ছিল 'আহমদীয়ত' এবং যেহেতু তারা আহমদী হিসেবে সুপরিচিত ছিল; এ কাজের জন্য সরকার বিদ্রোহীদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে সৈয়্যদ মীর আকবর, সৈয়্যদ আবুল হাসান, শেখ আব্দুস সামাদ ও আমীন গুলকে কারারুদ্ধ করলেন। শেষোক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে যেভাবেই হোক সপ্তাহকাল পরে মুক্তি দেয়া হয় এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রায় উনিশ মাস কারাগারে অন্তরীণ থাকে।

এরপর পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যদেরকে দুর্গাই নামক স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়, সেখানে কোন প্রকার গন্ডগোল ছিল না এবং সেখানকার লোকজন আমীরের প্রিয়ভাজন হওয়ায় সেখানে শান্তি ছিল। যা হোক, পূর্ব থেকেই মুক্তিপ্রাপ্ত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তায়্যেবের প্রচেষ্টায় খুশ্‌ত প্রদেশের প্রভাবশালী নেতা কর্তৃক শহীদ পরিবারের অনুকুলে আরও একটি আবেদন পেশ করা হয়, ফল স্বরূপ আমীরের সামরিক সচিব প্রকাশ্যে তাদের মুক্তির আদেশ জারি করেন, কিন্তু একই সময়ে গোপনভাবে গভর্নর (মোহাম্মদ গুল) ইন চার্জের নিকট পূর্বাদেশ প্রত্যাহার করে ভিন্ন নির্দেশাবলী প্রেরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি মুহাম্মদ তায়্যেব ও আব্দুস সালামকে তাদের পরিবারবর্গসহ গ্রেফতার করে কাবুলে সরিয়ে নেয়ার জন্য গোপন নির্দেশাবলী প্রেরণ করেন। এ অবস্থায় গভর্নর মুহাম্মদ তায়েবকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, এ আদেশদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টি বলবৎ থাকবে তা তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে যাচাই করে তার ফলাফল তাকে পরে অবহিত করবেন।

এ পরিস্থিতিতে সেখানে বসবাস করা নিরাপদ নয় বিবেচনা করে মুহাম্মদ তায়্যেব পালিয়ে যেতে মনস্থ করলেন এবং সে অনুসারে ঐ রাতেই তার আত্মীয়দের নিকট চলে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, তিনজন পার্বত্য পুলিশ কর্মকর্তা আব্দুস সালামকে গ্রেপ্তারের জন্য পূর্বেই আগমন করেছে। সুতরাং তিনি অতিসত্বর আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে গোপনে ঐ স্থান পরিত্যাগ করার প্রস্তুতি নিলেন এবং কারা ও কারারুদ্ধ ভাইদেরকেও তদ্রূপ করতে উপদেশ দিলেন। এভাবে মধ্যরাতে প্রহরীরা কোথাও ব্যস্ত থাকার সুযোগে তারা সবাই পলায়ন করলেন। প্রহরীরা যখন বাড়িটি শূন্যবস্থায় দেখতে পেল তখন তারা তাদের পিছনে ছুটলো এবং গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় সকাল বেলায় পলাতকদেরকে গোরবাজ এলাকায় ধরতে সক্ষম হ'ল। পুরো দলটিকে গ্রামে ফিরিয়ে আনা হ'লে বাহরাম নামক একজন ভদ্রলোকের যামীনে শিশু ও মহিলাদেরকে মুক্ত করা হয় এবং পুরুষদেরকে খুশ্‌ত ক্যান্টনমেন্টে সরিয়ে নেয়া হয়, যেখানে আব্দুস সালাম কারারুদ্ধ ছিলেন।

কিছুদিন পর খুশ্‌ত প্রদেশের গভর্নরকে বদলী করা হলে, কারাবাসীরা নতুন গভর্নর সমীপে তাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার অনুমতির আবেদন পেশ করলে তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত সদয়ের সাথে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়। অন্যান্যদের ব্যাপারে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে কাগজপত্র প্রেরণ করা হ'লে তাদের বিষয়টি খুশ্‌ত প্রদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিকট পাঠানো হয়, যিনি তার রিপোর্টে তাদেরকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। ফলে সবাই প্রত্যাবর্তনের অনুমতি পান। কিন্তু এক মাস অতিবাহিত হ'তে না হ'তেই পুনরায় তাদেরকে গ্রেফতার করে কাবুলে নেয়ার আদেশ জারী করা হয়। সে অনুসারে আবুল হাসানকে গ্রেপ্তার করে খুশ্‌ত প্রদেশের কেন্টনমেন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। তিনি তাকে জামিনে ছেড়ে দেন তার ভাইদেরকেও হাজির করার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁর আগমনে সমগ্র পরিবার একত্রিত হ'লে, কী করা উচিত সে সম্পর্কে পরামর্শ করেন। অবশেষে তারা চিরকালের জন্য আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যেহেতু সুদীর্ঘকাল যাবত তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। সে অনুসারে পুরো পরিবার ১৯২৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী দেশ ত্যাগ করেন এবং বানুতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তারা সৌভাগ্যবশতঃ কিছু ভূ-সম্পত্তিরও মালিকানা প্রাপ্ত হন।

(রিভিউ অব রিলিজিয়নস্)

- o -

about this book . . . .

In this short but comprehensive book the author has given a concise history of the events leading up to the acceptance of Ahmadiyyat by Hazrat Sahibzada Abdul Lateef, and his subsequent martyrtdom in the defence of his Faith.

Of particular interest to the Western reader should be the use by God of revelation, through dreams and visions, to the Hazrat Sahib as to the time of the coming of the promised Messiah and Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib, Peace be upon him. Such manifestations are not uncommon among members of the Ahmadiyya Community, and are one more proof of the fact that Islam is still the Living and Chosen religion of God.

Additionally all enemies of Islam should take ample warning from the fate that overtook the chief antagonists of the Martyr and his family.

The author has performed a sincere service to Islam by presenting these facts to the people of the West, and we all pray they may give rise to much heart searching thought among our non-Muslim friends.

N.A. SCRIVONER.

Hazrat Sahibzada Abdul Lateef^{ra}-Er Jibani

(The life of Hazrat Sahibzada Abdul Lateef)

by

B. A. Rafiq (London)

Transalated into Bengali by :

Abdullah Youshuf Mohammad

Additional Secretary Publication

Majlish Ansarullah, Bangladesh

Published by :

Majlis Ansarullah, Bangladesh

4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh